Issue cover not available

Vol. 17 | No. 2 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক

Volume	17
Issue	2
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহমুদা খাতুন
Published online	February 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v17i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i2.4
Pages	44-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক

মাহমুদা খাতুন

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক ও হাস্যরসাত্মক নাটকের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। হাস্য-কৌতুক ; ২। ব্যঙ্গ-কৌতুক ; ৩। গোড়ায় গলদ (প্রহসন) ; ৪। বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন) ; ৫। চিরকুমার সভা (প্রহসন) ; ৬। মুক্তির উপায় (প্রহসন)।

হাস্যকৌতুক—১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার থেকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। 'বালকে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প-উপন্যাসের সাথে এক ধরনের ছোট ছোট নাটিকা রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১২৯২ থেকে ১২৯৪ সালের মধ্যে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় এই ছোট ছোট কৌতুক নাটিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাগুলির প্রকাশের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

> সূর্যের আলো নাহিলে গাছপালা ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।...বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি—বিজ্ঞ লোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলি নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা ইহা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে, তাহারাই আমোদ-প্রমোদ করিতে জানে।

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় আনন্দ ও আমোদ বিতরণই এই নাটিকাগুলি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকে শুধু কিশোর বয়সীদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টাই নেই, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের ভ্রান্তি, মূঢ়তা ও গোঁড়ামিকে আঘাত করার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। সেজন্য শুধু নির্মল হাস্যরস ছাড়াও হাস্যকৌতুকের রচনাগুলির পটভূমিকাতে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ-মানসের বৃহত্তর পরিচয় বর্তমান।

সমাজ সমালোচনামূলক হাস্যরসাত্মক প্রহসন রচনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের হাতে পূর্ণতা লাভ ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সমানভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এঁদের প্রহসনে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ সামাজিক অভিজ্ঞতা, পরিশীলিত হাস্য- ও কৌতুক-প্রবণতা এবং সর্বোপরি সহানুভূতিশীল করুণাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, পরবর্তী পর্যায়ের প্রহসন রচয়িতাদের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ দুর্লভ হয়ে দাঁড়াল। প্রহসনকে হাতিয়ার করে ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিদ্বেষ প্রচার, মত ও আদর্শগত ব্যবধান প্রকাশ এবং আপন রুচি অনুসারে বিরুদ্ধ পক্ষকে আক্রমণ—এই পর্যায়ে প্রহসন রচনায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বিশেষতঃ নব্য হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের যুগে ব্রাহ্ম সমাজের নানা দিক—তাদের পারিবারিক আদর্শ, রুচি, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সামগ্রিক উচ্চ শিক্ষার বিকৃত রূপায়ণ প্রহসনের মধ্য দিয়ে অবাধে প্রচার হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্য অথবা প্রহসন এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যদিও সমাজ অথবা সামাজিক আদর্শের সমালোচনা জীবনবোধ সম্পন্ন সাহিত্যকারের সৃষ্টির মতই সতেজে তাঁর নাটকে উপস্থিত হয়েছে।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, হাস্য-কৌতুকের রচনাকাল 'মানসী' কাব্য রচনার যুগ। 'মানসী'তে প্রধানভাবে অন্তরঙ্গ কবিভাবনার প্রকাশ ঘটলেও দেশের নানা সমস্যা, জীবন বিশ্বাসের নানা অসঙ্গতি, সকল প্রকার মানসিক সংকীর্ণতা, আদর্শগত দুর্বলতা যে কবির অন্তরকে পীড়িত করে তুলেছিল, তার একাধিক প্রমাণ আছে। কবিতার মাধ্যমে সমাজ-আদর্শের ও মানবিক মূল্যবোধের নানা অসঙ্গতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর 'বঙ্গবীর', 'নবদম্পতির প্রেমালাপ', 'ধর্ম প্রচার' প্রচলিত ভ্রান্তি, অসার আত্ম-অহমিকা, ভীরুতা ও সকল প্রকার নীচতার প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ শ্লেষাঘাত। ব্যঙ্গ নাট্যে এই শ্লেষ ও বিদ্রূপ আরো মর্মঘাতী রূপ ধারণ করে। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে রবীন্দ্র-মানসে দেশের নানা ঘটনায় বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের পশ্চাৎ পটভূমিকায় এই বিক্ষোভই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। সমকালের কিছু ঘটনার উল্লেখও এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। ১২৯০ সালে শশধর তর্কচূড়ামণি নব্য হিন্দুধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। শশধর তর্কচূড়ামণি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে এক নূতন বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্ম সৃষ্টি করে সারা দেশ মাতিয়ে তুললেন। শিক্ষিত বাঙালী মন্ত্রমুগ্ধের মত ধর্মের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে নব্য হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি তুললেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রথম প্রচার করেছিলেন, এবং জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মকে প্রধানতঃ যুক্তিপন্থী করে ইতিপূর্বে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদের পছন্দ করতেন না, কিন্তু

তর্কচূড়ামণির আজগবি ব্যাখ্যাতেও তিনি সন্তুষ্ট হননি, এবং তাঁর অসন্তুষ্টি গোপন রাখেননি। 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন ঃ

> প্রথমে জিজ্ঞাসা হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুয়ানীতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পাইলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে সত্য সত্য বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়—এ সকল কি হিন্দুধর্ম? মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।

যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাস, গুরুবাদ ও আর্যামীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক অবহেলা ও বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু বাঙালী জাতির এই নূতন ভাববন্যাকে তিনি বিফলে যেতে দিতে চাইলেন না, একে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি উল্লেখিত সময়ের 'প্রচার', 'নব-জীবন' ও 'ধর্মতত্ত্বে' নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা করে সমর্থন যুগিয়ে যেতে লাগলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হৃদয়ের গভীরে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস যাই থাক, প্রকারান্তরে তিনি নিজেকে নব্য হিন্দুতন্ত্রের প্রধান সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা বলে প্রমাণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের এই নূতন ব্যাখ্যায় যুক্তি-ও বুদ্ধি-বিবর্জিতভাবে হিন্দুধর্মের সকল আচার-অনুষ্ঠানকেই বড় করে তোলা হল—উৎকট আর্যামী, গুরুবাদ, বাল্য বিবাহ, ধর্মবিলাস, কুসংস্কার সমস্তই নূতনতর ধর্মীয় মহিমা লাভ করল। এই পর্যায়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বঙ্কিমের সাথে দীর্ঘ তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। "সেই লড়াই-এর উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার 'ভারতী' ও 'প্রচারে' তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।" (জীবন স্মৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে ধর্মীয় আস্ফালন ও সংস্কার-অহমিকাকে শুধু যুক্তি দিয়ে পরাজিত করা যায় না—তাই তিনি আশ্রয় করলেন শ্লেষ ও ব্যঙ্গকে।

এ রবীন্দ্রনাথ কী তীব্র ও মর্মঘাতী হয়ে উঠতে পারেন তা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি কবিতাপত্রে ও 'শ্রীমান দামু বসু চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' ব্যঙ্গ কবিতায় বোঝা যায়। এই মানসিকতারই চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায় 'মানসী' কাব্য-গ্রন্থের ব্যঙ্গ কবিতায়, হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের ব্যঙ্গ রচনাগুলিতে। 'হাস-কৌতুকে'র ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> এই ক্ষুদ্র কৌতুক নাটকগুলি হেঁয়ালী নাট্য নাম ধরিয়া বালক ও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। ইউরোপে 'শারাড' নামে এক প্রকার নাট্য খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।

কিন্তু আঙ্গিক ও রসগত বিচারে ইউরোপীয় শারঙের সঙ্গে এর মিল অল্পই বলা যায়। শারঙের হেঁয়ালী কয়েকটি শব্দ ও সেই শব্দের অর্থের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলিতে অনুসৃত হয়নি—সামান্য শব্দগত হেঁয়ালী সৃষ্টি অপেক্ষা সেখানে একটি পরিপূর্ণ কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই নাটিকাগুলির সার্থক সাহিত্য-মূল্য কৌতুক সৃষ্টিতে। সাধারণভাবে বলা যায় এই নাটিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক উপাদান ব্যবহার করেছেন তা জীবনের সাথে ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত। সে জন্যই নাটকে নানা প্রকার অঘটন, ঘটনার বাড়াবাড়ি, উক্তি প্রত্যুক্তির আতিশয্য এসেছে। শুরুতে রচনার সজ্ঞান প্রচেষ্টাও লেখাকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"হেঁয়ালী রক্ষা করিতে গিয়া লেখাকে সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল" (ভূমিকা, হাস্য-কৌতুক)—মোটামোটিভাবে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—নানা মত, পরিস্থিতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সমস্যার উদ্ভাবন ও সমাধানে সর্বদাই কৌতুক-হাস্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

হাস্য-কৌতুকে শুধু কিশোর ও বালকের আনন্দ দেবার জন্য 'ছাত্রের পরীক্ষা' 'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা', 'রোগের চিকিৎসা', 'চিন্তাশীল' প্রভৃতি নাটিকাগুলি রচিত। এদের মধ্যে শুধুই কৌতুক, কোথাও ব্যঙ্গ অথবা শ্লেষ নেই। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন নানা তুচ্ছ কথাকে কেন্দ্র করে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের পরীক্ষায় অত্যাচারী শিক্ষকের প্রশ্নের জবাবে ছাত্রের চতুর উক্তিগুলি—উদ্ভিদ কি—যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে, যেমন কেঁচো, সিরাজউদ্দৌল্লাকে কে কেটেছে—পোকায়, কর্তা কে—ও পাড়ার জয়মঙ্গলী যিনি ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে থাকেন, ছ'টা সন্দেশ থেকে ছোট ভাইকে দুটো দিলে কটা থাকে—তার জবাবে এটাও দেব না, সব খেয়ে ফেলব—ইত্যাদি নির্মল কিশোর-উপভোগ্য কৌতুক। 'পেটে ও পিঠে' গল্পের বালকের অতিরিক্ত আহার লোলুপতার পরিণাম, 'অভ্যর্থনা'তে সদ্য এম. এ. ডিগ্রী লব্ধ চতুর্ভুজের (নামকরণের ব্যঙ্গ লক্ষণীয়) অপেক্ষা কাবুলী বেড়ালের আদরের জন্য মনোবেদনা করুণা-মিশ্রিত হাস্যের উদ্রেক করে।

কিন্তু 'ভাব অভাব', 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'একান্তবর্তী', 'আশ্রম-পীড়া', 'অন্ত্যেষ্টি', 'সংস্কার', 'রসিক' প্রভৃতি নাটিকাগুলি মানব-চরিত্র, তার বিচিত্র অভিব্যক্তি অবলম্বনে রচিত। সেজন্য এগুলির বক্তব্য গভীরতর। 'আর্য ও অনার্য', 'সূক্ষ্ম বিচার' ও 'গুরুবাক্য' মোটামুটিভাবে সমকালীন নব্যহিন্দুতন্ত্রের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা। তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাতে রবীন্দ্রনাথ এই মূঢ়তার মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। 'আর্য ও অনার্যে' তাঁর ব্যঙ্গ তীব্রতম—

অদ্বৈত—আর্য জিনিষটা কি মশায় ?

চিন্তামণি—(বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে আর্য কাকে বলে জানেন না ? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রী নকুড়কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা স্বর্গীয় নফরকুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

চিন্তামণি—বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।

অদ্বৈত—অনার্য আবার কারা ?

চিন্তামণি—যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রী নকুড়কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা স্বর্গীয় নফরকুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত—আর বলতে হবে না। অতএব যে হেতুক শ্রী নকুড়কুণ্ডু আমার বাবা নন, এবং স্বর্গীয় নফরকুণ্ডুর সাথে সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।

চিন্তামণি—তা বলতে পারিনে।

শশধর তর্কচূড়ামণির আর্যামীর এর চেয়ে কড়া সমালোচনা আর কি হতে পারে ? অন্যত্র।

চিন্তামণি—হাই তুলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা জানেন ?

সকলে—(সমস্বরে) আজ্ঞে আমরা কেউ জানি না।

চিন্তামণি—তবে ? এই যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে ঠেকলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন ?

সকলে—কিছু না।

চিন্তামণি—এই দেখুন দেখি ! এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র আলোচনা না করেই আপনারা বলেন ইওরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই গেলে কেন, তেল মাখে কেন এ আপনারা কিছু জানেন না।

সকলে—(সবিস্ময়ে) আশ্চর্য ! ধন্য ! আর্যদের কি বিজ্ঞান পারদর্শিতা, আর্য কুণ্ডু মশায়ের কি গবেষণা !

শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুদের আচার ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করেছিলেন, তাঁর মতে হাঁচি, টিকটিকি, শিখাধারণ প্রভৃতি সকল লোকাচার বৈজ্ঞানিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ সেই অযৌক্তিকতা ও বিচার-বুদ্ধিহীন মূঢ়তাকেই এখানে ব্যঙ্গ করেছেন। সমাজহিতৈষী

বাক্যবীর দৌলতচন্দ্র সাময়িক ভাবের আবেগে একান্নবর্তী পরিবারের গুণকীর্তন করার পর নিকট ও দূর আত্মীয়বর্গের দ্বারা তাঁর লাঞ্ছনার চিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কথায় ও কাজে যাদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না—দৌলতচন্দ্রের বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র ভর্ৎসনা বর্ষিত হয়েছে। 'সূক্ষ্ম বিচারে' সূক্ষ্ম তর্ক ব্যবসায়ীদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে। বেচারা কেবল রাম এক তার্কিক পণ্ডিতকে শুধু কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল—

কেবলরাম—মশায় ভাল আছেন ?

চণ্ডীচরণ—ভাল আছেন মানে কি ?

কেবলরাম—অর্থাৎ সুস্থ আছেন ?

চণ্ডীচরণ—স্বাস্থ্য কাকে বলে ?

কেবলরাম—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মশায়ের শরীর গতিক—

চণ্ডীচরণ—তবে তাই বল। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি কেমন আছি ? আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি এক হলো ?

দীর্ঘ সুমতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন বিচারের মধ্যে প্রত্যাহিক কুশল প্রশ্নের দুর্দশাগ্রস্ত পরিণাম উচ্চহাস্যের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। নব্য হিন্দুতন্ত্র আরোপিত গুরুবাদের মূর্খতা, অসার তত্ত্বালোচনা, পাণ্ডিত্যের আড়ালে বাকপটুতা, স্বার্থান্ধতা এসবই 'গুরুবাক্য' নাটিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। নিদারুণ ব্যঙ্গের একটু উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে :

কার্তিক—আমি তো বিষম মুশকিলে পড়েছি। আমার নাম কার্তিক আমার ছোট শালার নাম কীর্ত্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্ত্তি বলে ডাকতে পারে কিনা এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা ব্যাটার নাম কীর্ত্তিবাস। এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমার স্ত্রী যদি কীর্ত্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তা বৈধ হয় কিনা। বাড়ীতে কার্তিক পূজার সময় কার্তিককে মাত্তিক বলে নাম খারাপ করার দরুণ, ঠাকুরের কিংবা তাঁর মার, কোন অসন্তোষ ঘটে কিনা তাও জিজ্ঞাস্য।

রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু কেন মরেছিল এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা গুরুদেব কিভাবে করলেন তাও দেখা যাক।

গন্ধর্বদেব—প্রথমে দেখতে হবে রাবণেরই সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন, তারপরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধইবা হয় কেন, তারপরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ুই বা মরে কেন ; সবশেষে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু মরেই বা কেন।

এ উপহাস চাবুকের সাথে তুলনীয়।

ব্যঙ্গ কৌতুকে যে কয়টি নাটিকা আছে, তাঁর মধ্যে কৌতুক অপেক্ষা ব্যঙ্গের ভাগই বেশী। এই নাট্য গ্রন্থে পাঁচটি নাটিকা আছে, তার মধ্যে তিনটি—'বিনা পয়সার ভোজ', 'নূতন অবতার', 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' একক নাটক। 'বিনা পয়সার ভোজ' নাটিকাটির তেমন নাটকীয় গুণ নেই ; তবু বিনা পয়সায় ভোজন লোভী অক্ষয় বাবুর নাকাল হওয়ার কাহিনীটি পাঠকের মনে একটু করুণা ও সহানুভূতি সঞ্চার করে। অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি কৌতুকোচ্ছল রচনা। অরসিক স্বর্গীয় গোকুলনাথ দত্ত ইন্দ্রলোকে পৌঁচেছেন। ইনি মর্ত্যজন্মে চিন্তাশীল ও বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কৌতুক এখানে যে দেহত্যাগ করলেও চরিত্র্য-বৈশিষ্ট্য তাঁকে ছাড়েনি। ইন্দ্রলোকে এসেই তিনি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গের আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা—"আমি দেখছি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। অনেক উচ্চে থাকার দরুণ অক্সিজেন বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায় এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দন বনের তরুগুলি কার্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যাগ করার সময় পায় না—হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এদিকে ধুলো নেই,তাতে করে একেবারে রোগের বীজ নষ্ট হয়েছে।" স্বর্গ, সাধারণভাবে, তাঁর মতে "পৃথিবী এত দ্রুতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে—কনসারভেটিভ যত দূর হতে হয়।" দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রস্তাব—"দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পর মত আলোচনার জন্য একটি স্থান না থাকাতে বড়ই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা নন্দন বনের পারিজাত নিকুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে সেখানে একটি সভা স্থাপন করি এবং তার নাম দিই শতক্রতু ডিবেটিব ক্লাব।" কাণ্ড-জ্ঞানহীন পাণ্ডিত্য ও বাচালতার একটি হাস্যকর পরিণাম সুকৌশলে উপস্থিত করা হয়েছে।

ব্যঙ্গ কৌতুকের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটিকা 'স্বর্গীয় প্রহসন'। উল্লেখিত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স অল্প, ধৈর্য কম—কোন প্রকার ধর্মীয় অবাস্তবতাকে তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। হিন্দু ধর্মের এই পুনরুত্থানের যুগে লৌকিক দেব-দেবী—মনসা,

ঘেঁটু, শীতলা প্রভৃতির উপর নবীন মহিমা আরোপ করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এর অযৌক্তিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার অসহিষ্ণু ও শ্লেষাতিক্ত মনোভাব পোষণ করতেন। স্বর্গীয় প্রহসনে শীতলা, মনসা, ঘেঁটু প্রভৃতি তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর অকিঞ্চিৎকরতা, ক্ষুদ্রতা ও মানবিক সীমাবদ্ধতাকে তিনি প্রকট করে প্রখর বিদ্রূপের সাথে আক্রমণ করেছেন। এর ভাষা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও বিদ্রূপরঞ্জিত। স্বর্গে ইন্দ্র, শচী, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবদেবীগণ কলহপরায়ণ নিম্নরুচি লৌকিক দেবদেবীর দ্বারা কি প্রকার বিড়ম্বিত হয়েছেন তার বিদ্রূপপূর্ণ ও কৌতুককর বর্ণনা স্বর্গীয় প্রহসনে রয়েছে। হিন্দু ধর্মের ক্রম অবনতির কথা বৃহস্পতির মুখে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

> বৃহস্পতি—দেব সেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম বসন লম্বকচ্ছে কামিনীমোহন নির্লজ্জ নাগর মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীর প্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সাথে গোপন পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকাধুস্তুর সিদ্ধিপানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচ জাতীয় স্ত্রী-পল্লীর মধ্যে আপন বিহার-ক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন।

আগন্তুক দেবদেবীর সাথে ইন্দ্র প্রভৃতির কথোপকথনের একটি সরস বর্ণনা ঃ

> ইন্দ্র—হে ঘেঁটো! আপনকার—
>
> ঘেঁটু—ঘেঁটো কি? আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ দেখিনি গো! আমি যদি তোমায় ইঁদুর না বলে ইঁদুরে বলি?
>
> মনসা—তাহলেই চিত্তির হয়।
>
> (দেবীগণের হাস্য)
>
> ইন্দ্র—কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন সুকৃতির ফলে আপনকার স্মিত সকলের দশন-ময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল, এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।
>
> ঘেঁটু—রাখো, ওসব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে কি সব এনে দেয় খেতে পারি না। তোমার শচী গিন্নীকে

বলে দিও আমার জন্য রোজ এক থাল গোবরের লাড্ডু তৈরী করে পাঠিয়ে দেন।

কী বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্যের কী উচ্চহাস্য, ব্যঙ্গের কী শাণিত অস্ত্রাঘাত!

১২৯০ সালে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কৃষ্ণানন্দ নাম নিয়ে তন্ত্র উপাসনা শুরু করেছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে তিনি কল্কি অবতার। অবতাররূপে তাঁর কিছু শিক্ষিত চেলা জুটলো। রবীন্দ্রনাথ এই মূঢ়তাকে আক্রমণ করলেন তাঁর 'নূতন অবতার' নামক একক নাট্যটিতে। নূতন অবতার রুদ্রনারায়ণ বথশীর ইহ ও পারলৌকিক লোভের পরিণাম। বিদ্রূপের চড়া রঙে অঙ্কিত করে তিনি নূতন অবতার ও তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি শ্লেষপূর্ণ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্যে 'বশীকরণ' এক অঙ্কে এক দৃশ্যে সম্বলিত পাঁচ অঙ্কের দীর্ঘতম নাটিকা। এটিকে পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্র নাটিকার মর্যাদা দেওয়া চলে। এই নাটকটির মধ্যেও তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুকৃত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি-শাণিত দৃষ্টিপাত করেছেন। ধর্মীয় আচার-আচরণের বাড়াবাড়ি অপেক্ষা মানবিক সত্যবোধই জীবনে মঙ্গল ও কল্যাণ সূচিত করে, আশু ও অনদা উভয়েই নিজেদের ভ্রান্তিবহুল জীবন-বিশ্বাস ও আচরণের শেষে এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্যান্য রচনার মত 'বশীকরণে'র মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতা ততটা নেই, বরঞ্চ এক অনাবিল কৌতুক-মধুর হাস্যরস প্রধান্য লাভ করেছে। কাহিনীগুণে রবীন্দ্র-রচিত অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে আর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এটিকে Comedy of Errors বা ভ্রান্তিবিলাস জাতীয় কৌতুক নাটক বলা যায়। প্রহসনের কাহিনী পরিকল্পনায় রবীন্দ্র-প্রহসনে যে কষ্ট-কল্পনা, শিথিলতা ও অসঙ্গতি দেখা যায় 'বশীকরণ' তার থেকে অনেকটা মুক্ত। অভিভাবকের শাসনে স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত নিরাপরাধা স্ত্রীর ছলনা-জাল বিস্তার ও ভ্রান্তিজাত দৈব সহযোগিতায় পুনরায় পলাতক স্বামীটিকে খাঁচায় বন্ধ করা, একটি অসহায়া কন্যা-ভারগ্রস্তা বিধবার উপযুক্ত পুত্র লাভ এই ক্ষুদ্রাকৃতি নাটকটির কাহিনী-বস্তু। এরই মধ্যে সুকৌশলে সামাজিক বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব উপস্থিত করা হয়েছে। চরিত্র স্বাভাবিক, সংলাপ চতুর সংক্ষিপ্ত, ঘটনাপ্রবাহ বাস্তব-নির্ভর।

সমাজের বিশেষ আদর্শ ও ব্যক্তিকে আক্রমণ করে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনার পর্ব ব্যঙ্গ-কৌতুকেই শেষ হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য-স্বরূপতার একটি ব্যতিক্রমী দিক হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের এরূপ শাণিত

ব্যবহার তাঁর আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যুবক রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, কুসংস্কার ও তার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব, প্রতিপক্ষকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করার প্রবণতা উল্লেখিত নাট্য গ্রন্থ দুইটিতে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে রবীন্দ্র-মানসের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দুইটি কৌতুক রসাত্মক নাটকের মূল্য আছে।

কৌতুক নাটকের ধারাবাহিক আলোচনায় পরবর্তী তিনটি রঙ্গনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'। এই তিনটি নাটক অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত হয়েছিল—বিষয়গত ও ভাবগত ঐক্যও সেজন্য এগুলির মধ্যে রয়েছে। বিবাহ সমস্যা তিনটি নাটকেই মূল কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ('বশীকরণ'ও তার ব্যতিক্রম নয়)। 'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য ও নাট্যানুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধ্যাকালীন অবসর বিনোদনের জন্য সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সঙ্গীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক। এই সমাজে স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু গীতি-নাট্য ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতি', 'অলিকবাবু' সহ বহু নাটক ও গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এর পরম উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সঙ্গীত-সমাজে অভিনয়ের জন্যই তিনি 'গোড়ায় গলদ' রচনা করেন এবং প্রথম রজনীর অভিনয়ে নিজে অংশ গ্রহণ করেন। 'গোড়ায় গলদ' পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটকে বাংলা প্রহসন অপেক্ষা ইংরেজী কমেডি নাটকের প্রবণতা অধিক—কারণ এই নাটকে ব্যঙ্গ কষাঘাতহীন নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক প্রাধান্য পেয়েছে। 'মানসী'র যুগের নাট্য সৃষ্টির মত সমাজ ও মতের সমালোচনা নয়, তরুণতরুণীর প্রণয়-লীলাকে কেন্দ্র করে মানবিক ভ্রান্তি ও কৌতুককর দুর্বলতা এই নাটকের কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে যে সমাজ-চিন্তা, সামাজিক ভ্রান্তি নির্দেশ, পরিবেশ অনুকূল সজীব চরিত্র সৃষ্টি ও বাস্তব সংলাপ পাওয়া গিয়েছিল, রবীন্দ্র-প্রহসন তাদের সমগোত্রীয় নয় বলে এই বিশিষ্ট দিনগুলি 'গোড়ায় গলদ' থেকে পরবর্তী প্রহসনগুলিতে দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

নাটকের প্রধান ঘটনা কৌতুক ও ভ্রান্তি থেকে উপজাত—এই হিসাবে 'গোড়ায় গলদ' একটি ভ্রান্তিবিলাস নাটক।'[১] তরুণ বয়সে নরনারীর মনে পরস্পরের জন্য যে আগ্রহ, কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সংসার জীবনে তার কৌতুকাবহ পরিণাম ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে। 'গোড়ায় গলদে'র এইটিই প্রধান শিল্পমূল্য। এই নাটকের কৌতুকরস একান্তভাবে ঘটনামূলক আবর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত,

---

১. প্রমথনাথ বিশী

ঘটনা সৃষ্টিতেই নাট্যকারের সবটুকু মনোযোগ আবদ্ধ রয়েছে বলা যায়। 'গোড়ায় গলদে' কৌশলক্রমে মূল বক্তব্যের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে দুইটি গল্প সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত বিনোদ তরুণ মনের স্বপ্ন ও দায়িত্ববোধহীন উৎসাহ নিয়ে অকস্মাৎ কমলমুখীকে বিবাহ করেছে। কিন্তু পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ অথবা স্ত্রীকে গ্রহণ কোনটিই তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই স্ত্রীর নীরব ভালবাসাকে বুঝতে অক্ষম হয়ে সাময়িকভাবে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। আবার প্রধান ধারায় নিমাই ও ইন্দুমতী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরকে হৃদয় সমর্পণ করেছে—কিন্তু নাম ভুলের জন্য গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে মিলনের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হয়েছে। কৌতুকাবহ ঘটনার ক্রম পরিণতিতে অবশ্য দুই গল্পের পরিসমাপ্তিতেই মধুরেন সমাপয়েৎ হয়েছে। নাটকের গল্প বর্ণনায় আগেই বলা হয়েছে ঘটনার আধিক্য ও বাহুল্য আছে। তাই কাহিনী একান্তভাবে ঘটনানির্ভর হয়ে অগ্রসর হয়েছে, সর্বদা কার্যকারণবোধ অথবা যুক্তিযুক্ততা রক্ষিত হয়নি। নাটকে বর্ণিত দুই ধারার কাহিনীর মধ্যেই কৃত্রিম সমস্যা ও কৃত্রিম সমাধান দেখা যায়। বিনোদ বিহারীর আকস্মিক বিবাহ-প্রস্তাব ও বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হওয়া একেবারেই অবাস্তব মনে হয়। বাংলাদেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অভাব না থাকলেও বিবাহ-প্রস্তাব আসামাত্র অভিভাবকের সম্মতিদান একেবারেই অসম্ভব—বিশেষ করে নিবারণ কমলমুখীকে সত্যই স্নেহ করতেন। বন্ধু-বান্ধবসহ পাত্র নিজে বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে কন্যার অভিভাবকের কাছে উপস্থিত হওয়াটাও নিতান্তই লঘু কল্পনা। নাটকীয় সমস্যার এরূপ আরও বলপূর্বক সমাধান এ নাটকে দেখা যায়।

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র নিয়ে মোটামুটি সকল চরিত্র বিকাশের চেষ্টা এই নাটকে আছে বলা চলে। চরিত্র-বৈচিত্র্য কমেডি নাটকের প্রধান দিক—মোটামুটিভাবে সেই দাবী 'গোড়ায় গলদে' স্বীকৃত। নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতেই এই বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইন্দুমতী বাকপটু, পরিহাসপরায়ণা। কমল বুদ্ধিমতী অথচ অন্তর্মুখী। শান্তমণি স্বামী-প্রেমে অনন্যপরায়ণ। নিমাই ও বিনোদ বিহারী রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের জোড়-বাধা চরিত্রের অনুরূপ। বিনোদ কবি—সর্বদাই দিবাস্বপ্নে মশগুল, নিমাই ইন্দুমতীর প্রেমে পড়বার পূর্ব পর্যন্ত স্থিরমস্তিষ্ক বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে নারী সংস্পর্শে আসার পর উভয়েই বিবেচনা বুদ্ধি হারিয়েছে। চন্দ্রকান্ত নাটকের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার কাব্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি নাটকে তাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। নলিনাক্ষ্য বিনোদকে ভালবাসে, পুরুষ বন্ধুর প্রতি তার উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভালবাসা নাটকে বার বার হাস্য সঞ্চার করেছে। ললিত তখনকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি যথার্থ চরিত্র—ইংরেজী-বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত তার মুখের ভাষা,—সে বড় বড় কথা বলে, অথচ পয়সার লোভে

অন্যের পরিত্যক্ত কুশ্রী মেয়েকে অনায়াসে বিবাহ করে। নিমাইয়ের বাবা শিবচন্দ্র উজ্জ্বল ও উপভোগ্য চরিত্র। তিনি নিমাইয়ের বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর, পাত্রী হিসাবে ইন্দুমতী ও কাদম্বরীর পার্থক্য তাঁর পক্ষে বোঝা ভার। নাটকটিতে চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাথে প্রেমের রূপ-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রহসনের মধ্যে তিন জোড়া পাত্র-পাত্রী নিজেদের জীবনে তিনটি ভিন্ন প্রেম প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছে। ক্ষান্তমণি চন্দ্রকান্তর প্রেম প্রাত্যহিক দাম্পত্য জীবনের অম্লমধুর স্বাদযুক্ত ; বিনোদ কমলমুখীর প্রেম বাস্তব স্পর্শ ও দায়িত্ববোধহীন অতি রোমান্টিক ; নিমাই, ইন্দুমতী বাস্তব কল্পনায় মেশা রোমান্টিক।

কিন্তু সামগ্রিক নাটক বিচারে এ সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও 'গোড়ায় গলদ'কে একটি সার্থক কমেডি নাটক বলা যায় না। সমগ্র নাটকটি মূলতঃ ঘটনানির্ভর, চরিত্রনির্ভর নয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেন বলেন—"এই প্রহসনের মূল উপজীব্য চরিত্র সৃষ্টি নহে, আর্টের কাজ চরিত্র সৃষ্টি, মানব হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান দান। ঘটনার সন্নিবেশ সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানের উপায় মাত্র। ইহাই যদি মুখ্য হইয়া পড়ে, তবে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।" ডঃ সেনগুপ্তের মতে এই ধরনের সীমাবদ্ধ নাটক পরিকল্পনায় উচ্চাঙ্গের আর্ট সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, এবং 'গোড়ায় গলদে' তা হয়ওনি। প্রহসনে অথবা কমেডি নাটকে ঘটনার জাল বিস্তার করে নাট্যকার আপন বক্তব্যে পেঁছুতে পারেন, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হওয়া চাই এবং তার বাস্তব ভিত্তি থাকা দরকার। আমাদের মনে হয় গভীর চরিত্র সৃষ্টি ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথ এই কমেডি নাটকটি রচনায় সার্থক হতেন যদি সকল ঘটনার বাস্তব ভিত্তিটি দৃঢ়মূল হতো, এবং ঘটনা পারম্পর্য রক্ষিত হতো। 'গোড়ায় গলদে'র নায়ক-নায়িকার চরিত্রে যে স্বাতন্ত্র্য পরিকল্পিত হয়েছে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা নাটকে নেই। তাদের চরিত্রের মধ্যে ঘটনাজাত পরিবর্তনেরও কোন সঠিক কারণ নির্দেশ করা হয়নি। বিনোদ কাব্য লেখে—হঠাৎ আবেগের বশে কমলমুখীকে বিবাহ করেছে—অথচ বিবাহের পরপরই তরুণী স্ত্রীকে শ্বশুরগৃহে ফেরৎ দেওয়া সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ নেই। একবার দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল সত্য কিন্তু নববিবাহিত প্রেমাসক্ত দম্পতির সেই বাধা উত্তীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কমলমুখীর পিতৃসম্পত্তি লাভ করা, পলাতক স্বামীটিকে স্বভাববিরুদ্ধ প্রগলভ আচরণে আঁচলে বাঁধা—এর মধ্যে মানসিক পরিবর্তনজাত কোন ব্যাখ্যা নাট্যকার দেননি। নাটকের মূল কাহিনীটি যে ভ্রান্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে—নিমাই ও ইন্দুমতীর সঠিক পরিচয় না জানা—এটিও অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে হয়। বন্ধুবৎসল চন্দ্রকান্তের কোন বন্ধুর প্রকৃত পরিচয় ক্ষান্তমনির দীর্ঘদিন অজ্ঞাত থাকবে—এ নিতান্তই কষ্টকল্পনা। অথচ এ দুর্বল ভিত্তির উপর নাটকের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে।

এই নাটকে বাস্তবতাবোধ একাধিক বার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। 'গোড়ায় গলদে' উচ্চশিক্ষিতা নারীচরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত সামাজিক বিধিকে অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করেছেন। ইন্দুমতী নিমাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়কালে যে প্রগলভ আচরণ করেছে, তৎকালীন শিক্ষিত রমণী সমাজে তা অকল্পনীয়। গোড়ায় গলদের মধ্যে, বস্তুতঃ একবারও সাধারণ বাঙালী জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি কষ্ট কল্পনার ভাব লক্ষ্য করা যায়। গোড়ায় গলদে বলা হয়ে থাকে wit ও humour-এর সম্মিলন ঘটেছে। চরিত্রসমূহের সাথে জীবনের সংযোগ শিথিল বলে সংলাপের বাগবৈদগ্ধ্য ও হাস্যরস বহু স্থলেই উপযুক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেনি। নাটকের সংলাপ শুধু চতুর ও সুন্দর হলেই চলে না—তাকে জীবনধর্মী বাস্তব গুণসম্পন্নও হতে হয়। 'গোড়ায় গলদ' অভিনয় উপযোগী গুণেও দুর্বল। একাধিক দৃশ্য শিথিল ও বাক্যবহুল। সংলাপ সময়ে সময়ে এত দীর্ঘ যে নাটকের গতিভার মন্থর না হয়ে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে নেপথ্য বিধান ও স্বগত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক নাটকে এর উপযোগিতা নেই বললেই চলে। এইসব ত্রুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। সাঁইত্রিশ বৎসর পর, ১৩৩৫ সালে তিনি 'গোড়ায় গলদে'র মার্জিত রূপ প্রকাশ করেন—নামকরণ করা হয় 'শেষ রক্ষা'। ঘটনা বিন্যাসে 'শেষ রক্ষা' দৃঢ় ও সংহত। উত্তর প্রত্যুত্তর সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বলে 'শেষ রক্ষা'য় হাস্যরস আরো মার্জিত রূপ লাভ করেছে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'গোড়ায় গলদে'র পরবর্তী প্রহসন, ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সকল প্রহসনের মধ্যে এই সংহত, স্ত্রী-চরিত্র-বর্জিত করুণ হাস্যরসের প্রহসনখানি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতম। 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রহসনকে প্রথম প্রকাশের পর কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি ; কারণ এর মধ্যে শিল্পের যে পূর্ণতা আছে তা ঘসা-মাজার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র তিনটি দৃশ্যে সংহত, সংক্ষিপ্ত এই প্রহসনখানি প্রথম থেকে শেষ অবধি এক করুণ হাস্যে উজ্জ্বল। প্রহসন শ্রেণীভুক্ত হয়েও 'গোড়ায় গলদ' অথবা পরবর্তী রচনা 'চিরকুমার সভা'র মত এর মধ্যে অবিমিশ্র হাস্যরস নেই—কারণ রসের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহকে 'বৈকুণ্ঠের উইলে' অনুভব করা যায়। বাতিকগ্রস্ত আত্মভোলা প্রকৃতির সরল হৃদয় বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠের জীবনের একটি বিশেষ সময় সহানুভূতি-কোমল দৃষ্টিতে উপস্থিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আর কোন রঙ্গনাটকে এই ধরনের সকরুণ মাধুর্যের শিল্পগত পরিচয় নেই।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজ পারিবারিক জীবনের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। সুকুমার সেন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন—"বৈকুণ্ঠ বড়দাদা

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি।" এ উক্তি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় কর্তৃকও সমর্থিত। এছাড়া "চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাউকে কিছু বলতে না পারার দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল।" [১] বৈকুণ্ঠের মত বাতিগ্রস্ত অসংসারিক লোক সংসারে হাসির পাত্র বটেই, কিন্তু এই ধরনের চরিত্রের পশ্চাতে যে একটি সরল মধুর হৃদয় গোপন থাকে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা অনুভব করার প্রমাণ নাটকে রয়েছে।

বৈকুণ্ঠের খাতা বোধকরি, রবীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রহসন, সেখানে ঘটনা ও চরিত্রের শিল্পগত সম্মিলন ঘটেছে। মাত্র তিনটি দৃশ্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক ঘটনা সংক্ষিপ্ত সংলাপ ও সজীব চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকের মূল বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ঘটনার বিন্যাসে আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রহসন স্ত্রী-চরিত্র-বর্জিত, যদিও নেপথ্য থেকে দু'একটি চরিত্র নাটকের কাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র পরিসরে প্রায় সব চরিত্রই অভিনব বাস্তববৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক ব্যবহার এই নাটকের আর একটি বড় দিক। কিন্তু একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে প্রহসনটির উচ্চাঙ্গ শিল্পলক্ষণ প্রধানতঃ চরিত্র-সৃষ্টির সফলতাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্র বৈকুণ্ঠ সংসার-অনভিজ্ঞ ও নিস্পৃহ ব্যক্তি। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর একটি বই আছে, নিজের লেখাপড়া নিয়েই তিনি মত্ত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশের বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সেদিকে বৈকুণ্ঠের খেয়াল নেই। এতদিন অবিনাশের খামখেয়ালী দাদা আর গাছপালা নিয়েই বেশ চলে যাচ্ছিল—কিন্তু ধুরন্ধর কেদারের কৌশলে তার শ্যালিকাকে দেখা পর্যন্ত তার মানসিক শান্তি বিপর্যস্ত। বৈকুণ্ঠ লেখা শোনাবার জন্য কেদারকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কিন্তু অবিনাশের সাথে তার শ্যালিকার বিবাহ হবার পরে অনুগত শ্রোতা হওয়া দূরের কথা, কেদার বৈকুণ্ঠকেই বাড়ী ছাড়া করবার উপক্রম করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রক্ষা পেল ;—নববিবাহের সাময়িক মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে অবিনাশ কেদার এ্যাণ্ড কোম্পানীকে বিতাড়িত করে নিজ গৃহ নিরুপদ্রব করল।

বৈকুণ্ঠের জীবনের অবলম্বন দুইটি—লেখার নেশা ও ভ্রাতৃস্নেহ। প্রহসনের ঘটনা-চক্রে দুটিরই ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছে দেখা যায়। জোর করে নিজ রচনা শোনাবার নির্দোষ আগ্রহ তাঁর আছে, কিন্তু কপট প্রশংসা, ছল ও চাতুরী এই নির্বিরোধী সরল প্রকৃতির বৃদ্ধটির অন্তরে বেদনা আনে। কেদার যখন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কপট প্রশংসা জানিয়ে বলে—"লেখা যা হয়েছে, পড়তে ওর নাম কি—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে—" একে নির্দয় উপহাস বলে বুঝে নিতে বৈকুণ্ঠের দেরী হয় না। অভিমানী বৃদ্ধ বলেন—"হা হা হা।

---

১. রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

রোমাঞ্চ ! আপনি ঠাট্টা করছেন। সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস—মাথা আর মুণ্ড। বুড়ো মানুষকে আর পরিহাস করবেন না কেদার বাবু।" কনিষ্ঠ অবিনাশের সুখের সংসারে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে যখন তিনি সংসার ত্যাগে উদ্যত—তাঁর জীবনের একটি মাত্র আনন্দ অবলম্বনও তিনি ত্যাগ করেছেন—"আমার লেখা। সে আবার একটা জিনিষ ! সবাই হাসে তা কি আমি জানিনে, ঈশেন ! ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখার কোন দরকার নেই।" কনিষ্ঠ অবিনাশের তাঁর প্রতি ভালবাসায় সন্দেহ অসহায় বৈকুণ্ঠের দ্বিতীয় বেদনা। সংসার থেকে তাঁকে উৎখাত করার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে অবিনাশের যোগ আছে একথা তাঁর হৃদয় মানতে চায় না। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য যখন বলে অবিনাশ সবই জানে শোকাহত বৃদ্ধ তা বিশ্বাস করতে চান না—

> দেখ ইশেন, তোর কথাগুলি বড় অসহ্য। তুই একটা মিষ্টি কথাও বানিয়ে বলতে পারিসনে ? এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি মানুষ করলাম, একদিনের জন্যও চোখের আড়াল করিনি, আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না—এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা ব্যাটা ! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে ! লক্ষ্মীছাড়া পাজী, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়।

উদ্ধৃতি হয়ত দীর্ঘ হলো—কিন্তু এই আন্তরিক বেদনার অনুভূতিই প্রহসনটির মধ্যে গভীর সুর সঞ্চার করেছে।

এই নাটকের সব চরিত্রই বাস্তব ঘেঁষা। কমেডি নাটকে বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি অত্যন্ত আবশ্যিক শিল্পলক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক নাটকসমূহে এই মানের বাস্তব চরিত্র খুব বেশী নেই। বৈকুণ্ঠ-ভ্রাতা অবিনাশ বাস্তবসম্মত চরিত্র। দাদার প্রতি ভক্তি, গাছপালার নেশা, অতিক্রান্ত যৌবন অবিনাশের বিবাহের স্পৃহাকে দমন করতে পারেনি। নববিবাহের নেশাতে স্বাভাবিকভাবেই কিছুকাল আচ্ছন্ন থাকলেও ঠিক সময়েই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। তিনকড়ি ও কেদার মানিকজোড় চরিত্র, তবু তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিকল্পিত হয়েছে। উভয়েরই জীবনের ধরণ ও উদ্দেশ্য এক, তবু তারা এক নয়। কেদার অতিশয় ধূর্ত, স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনা তার মজ্জায় মজ্জায়। বৈকুণ্ঠের সংসারে সে স্থায়ী আসন গেড়েছে—তবু সে বৈকুণ্ঠকে বাড়ী-ছাড়া করতে চায়। তিনকড়ি ছলনা ও কপটতার ধার ধারে না—যা চায় মুখ ফুটেই চায়। মানবিক অনুভূতিকে সে পিষে মারেনি—তাই অসহায় বৈকুণ্ঠের প্রতি সে স্নেহপরায়ণ, দয়ার্দ্র ঈশান সুঅঙ্কিত চরিত্র, ভৃত্য হয়েও নিঃস্বার্থ স্নেহ ও কর্তব্যবোধ দ্বারা সে বৈকুণ্ঠ পরিবারে অভিভাবকের পদ দখল করে

নিয়েছে। অন্তরালবর্তিনী বৈকুণ্ঠ-কন্যা বিধবা নীরদ পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি অধিকার করে।

'চিরকুমার সভার প্রথম আবির্ভাব রঙ্গ উপন্যাস রূপে 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৭—৮ সালে। প্রথমে এর নাম 'চিরকুমার সভা'ই ছিল, কিন্তু ১৩১৪ সালে স্বতন্ত্র পুস্তক আকারে প্রজাপতির নির্বন্ধ নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিকে কিছু পরিবর্তন করে নাটকীয় রূপ দান করেন এবং পুনরায় নাম দেন 'চিরকুমার সভা'। 'চিরকুমার সভা' উপন্যাসটি সাময়িক পত্রিকার তাগাদায় লেখা। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, 'ভারতী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদিকা সরলাদেবী তাঁকে একটি কৌতুকময় সামাজিক প্রহসন লিখে দিতে অনুরোধ করেন। তার ফল 'চিরকুমার সভা'। 'চিরকুমার সভা' উপন্যাস হলেও এটি প্রায় নাটকের রীতিতে লেখা।

'চিরকুমার সভা' রচনার পশ্চাতে একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ও পটভূমি ছিল। এই সময়টি একটু বিচিত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলাদেশে ও বাইরে কৌমার্যব্রতধারী এক নূতন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তুলছেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও প্রেরণায় শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌমার্যব্রতের প্রতি একটি ক্রমবর্ধমান অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কৌমার্যব্রত অথবা সংসারবৈরাগ্যগত সন্ন্যাসের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেননি—কৈশোরে রচিত প্রকৃতির প্রতিশোধে তার প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এই প্রহসন রচনার সময় সন্ন্যাসের নূতন আন্দোলনকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে লেখকের মনে ছিল।" বস্তুতঃ সামাজিক প্রহসন রচনা করতে বসে এই সন্ন্যাস সাধনার ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা তাঁর মনে জাগরূক ছিল। সরস পরিহাস ও সুচতুর ব্যঙ্গে সেই আদর্শকে তিনি 'চিরকুমার সভা'য় বিপর্যস্ত করেছেন। শুধু 'চিরকুমার সভা' ও প্রজাপতির নির্বন্ধে নয়, সমসাময়িক কাব্য 'ক্ষণিকা'য়ও ঠাট্টার ছলে বলেছেন :

আমি হবনা তাপস, হবনা হবনা
যেমনি বলুন যিনি
আমি হবনা তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী

পরিহাসের লঘু ভঙ্গীতে যা এখানে বলা হয়েছে, জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ গভীরতা নিয়ে তাই বললেন 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন

মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যের আদর্শ সন্ন্যাসের লৌকিক আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে—১৩০০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়, একে আশ্রয় করে দেশের মানুষের জীবনের নানা তথ্য, পল্লী-সংস্কার, পল্লী-সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং যুবক, শ্রেণীর দেশের সামগ্রিক কল্যাণ-প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার গুরুত্বের কথাও বার বার বলেন। 'চিরকুমার সভা'তে দেশের কল্যাণচিন্তা আছে—চন্দ্রমাধব বাবু একাধিকবার এই দেশহিত-ব্রতের উল্লেখ করেন। বৈরাগ্য অথবা ইন্দ্রিয়-নিরোধ নয়, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে প্রকৃত মানুষ হওয়াতেই জীবনের পরিপূর্ণ গৌরব ও মহিমা—এটিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল। সেই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে 'চিরকুমার সভা'তে।

বলা হয়ে থাকে 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্য, উপমা রূপকের ঘটা, যমক অনুপ্রাস-শ্লেষের দীপ্তি-অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ ও কাব্যিক অনুভব সৃষ্টিতে 'চিরকুমার সভা' একটি অপরূপ রচনা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে wit ও **humour**-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা আছে— wit বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গের হাসি, **humour** করুণাপূর্ণ হৃদয়ের উচ্চ হাসি। রবীন্দ্রনাথের হাস্য সাধারণতঃ wit ধর্মীয় কিন্তু 'চিরকুমার সভা'য় **wit** ও **humour**-এর সার্থক সম্মিলন ঘটেছে। কৌতুক প্রবণতা ব্যঙ্গের উপর প্রধান্য লাভ করেছে। 'চিরকুমার সভা'কে তাই বিদ্রূপাত্মক না ভাবাই উচিত—আঘাত অপেক্ষা আনন্দ আয়োজন এই নাটকে বেশী।

'চিরকুমার সভা'তে কাহিনী-অংশ অল্প, সামান্য গল্প-অবলম্বনকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার 'চিরকুমার সভা'র ভূতপূর্ব সদস্য—তার এই অবিবাহিতা শ্যালিকা—রূপবালা, নীরবালা। তাদের বিবাহের জন্য পরিবারের সকলেই ব্যস্ত। বিবাহযোগ্য পাত্র হিসাবে অক্ষয়কুমার সভার দুই কুমারব্রতধারী যুবক শ্রীশ ও বিপিনকে নির্বাচিত করলে। 'চিরকুমার সভা'র অন্য সদস্য পূর্ণ ইতিপূর্বেই সভাপতির ভাগিনেয়ী নির্মলাকে হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছে। অক্ষয়ের কৌশলে শ্রীশ ও বিপিন ধরা দিল এবং সামান্য বাধা অপসারিত হবার পর পূর্ণ নির্মলার হৃদয় লাভ করল। নাটকের বক্তব্য বিষয় কৌমার্য-ব্রতের বিরুদ্ধে প্রেমের ষড়যন্ত্র ও ব্রতের সম্পূর্ণ পরাজয়। পূর্ববর্তী প্রহসনসমূহে আমরা লক্ষ্য করেছি নাট্যকার নাটকের ঘটনা সংস্থাপনে অধিক মনোযোগী ছিলেন এবং হাস্য-রস সৃষ্টিতে ঘটনার চরিত্র অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ছিল। কিন্তু 'চিরকুমার সভা'তে ঘটনার

দৈন্য ও কাহিনীর দুর্বলতার সাথে দেখা যায় 'চিরকুমার সভ'র মূল বক্তব্যকে কাহিনীর যথোচিত সম্প্রসারণ, ঘটনার বিশ্লেষণ ও চারিত্রিক রূপায়ণের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। আদর্শবোধ ও হৃদয়াবেগ—এই দুই বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব প্রহসনের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে ব্যক্ত করা উচিত ছিল। যারা মানবহিতে ব্রতধারণ করেছিল তাদের সংকল্পচ্যুতি ও ব্রতভঙ্গের জন্য কোন মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় নাটকে নেই। মনে হয় ব্রত ভঙ্গ করার জন্যই এরা উদগ্রীব। শ্রীশ ও বিপিন অতিমাত্রায় রোমান্টিক—চন্দ্রমাধব কুমার-সভার সভাপতি, দেশে সামগ্রিক কল্যাণ-প্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, সেন এ বিষয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন—"যে চিরকুমারের ব্রত ভঙ্গের জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু রুমাল ও গানের খাতা হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যের সৃষ্টি হয় তা উচ্চাঙ্গের নহে।" সেইজন্যই 'চিরকুমার সভা'র হাস্যরস কাহিনী, চরিত্র অথবা ঘটনা সংস্থাপনে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্যে।

কাহিনীর পরিকল্পনার দৈন্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রকট। শৈল বিধবা, হিন্দুগৃহে তার আচার-আচরণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। পুরুষের বেশে চিরকুমারদের কাবু করে ছোট ভগ্নীদুটিকে তার স্বামী উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতান্ত কষ্টকল্পনা ও অবাস্তব। তাছাড়া নাট্যকার 'চিরকুমার সভা'য় একটি অপরূপ প্রেমের জগৎ সৃষ্টি করেছেন—বিধবা শৈল সেখানে ছন্দপতন। প্রহসনের মূল মেজাজে এটি একটি বড় ত্রুটি। নৃপ ও নীরুর সম্ভাবিত পাত্র দুটির লাঞ্ছনা একেবারেই অকারণ। বাস্তব পরিবেশ অঙ্কনে বারবার ব্যর্থতা এসেছে। যে সমাজে এই প্রহসনের ঘটনা ঘটেছে—তা বাস্তব নয়—সমকালীন সামাজিক পরিবেশ তার মধ্যে বিধৃত হয়নি।

চন্দ্রমাধব চরিত্রে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অনেক মিশল আছে। তার মধ্যে কতক মেজদাদা, কতক রাজনারায়ণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে।" আদর্শবাদী সংসার-নিস্পৃহ, আত্মভোলা প্রকৃতির এই ধরণের পুরুষ-চরিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রীতি ছিল। 'গোরা' উপন্যাসের পরেশবাবু চরিত্রের সাথে এর মিল দেখা যায়। চন্দ্রমাধব কুমার-সভার সভাপতি, দেশে সামগ্রিক কল্যাণ প্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, কিন্তু মাতৃপিতৃহীনা নির্মলার প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ আছে। নির্মলার সুখের জন্যই কুমার সভা তিনি ভেঙে দিয়েছেন। এই মানবিক পরিচয় প্রতিষ্ঠাতেই এই চরিত্রের সার্থকতা। এই প্রহসনের কৌতুক রস প্রধানতঃ উৎসারিত হয়েছে অক্ষয় ও রসিকের দ্বারা। বাঙালী সমাজে ঠাকুরদাদা নাতনী, ভগ্নিপতি শ্যালিকা সম্বন্ধের মধ্যে যে সরসতা আছে—রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। অক্ষয় ও রসিক উভয়েই কাব্যানুরাগী—অক্ষয়ের সঙ্গীত উচ্ছ্বাস, রসিকের সুমধুর সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি ও অনুবাদ নাটকটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। নৃপ, নীর জোড় বাঁধা চরিত্র—নৃপ ধীর ও

শান্ত, নীর চঞ্চল ও অস্থির। দুই বোন দুই সখীর মত। তাদের আবির্ভাব নাটক উপভোগে বসন্তবাতাসের কাজ করেছে।

"গল্প গুচ্ছে"র 'মুক্তির উপায়' বলে একটি ছোট গল্পকে রবীন্দ্রনাথ একই নামে প্রহসন রূপ দান করেন। এর মধ্যে প্রথম দিকেও রঙ্গ নাটকের বিষয়বস্তুর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের নায়ক ফকিরচন্দ্র স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। সুন্দরী স্ত্রী হৈম অথবা ঘরসংসারের দিকে তার নজর নেই, অপরিমিত গুরুভক্তিতে তার বিবেচনাবোধ সর্বদাই আচ্ছন্ন। হৈম এ-ব্যাপারে কলেজে পড়া দিদি পুষ্পমালার সাহায্য চাইল। কৌতুকের নানা ঘটনার মধ্যে পুষ্পমালা ফকিরকে উদ্ধার করে হাতে ফিরিয়ে দিল। ছোট গল্পের মধ্যে কাহিনী সংহত ছিল, প্রহসনে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়—ছোট গল্পের নাটকীকরণ তেমন সার্থক হয় না, এক্ষেত্রেও সেই একই ব্যর্থতা এসেছে। বক্তব্য গুটিকয় চরিত্র, অল্প ঘটনার মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছিল, নাটকে অতিরিক্ত ঘটনা ও চরিত্র সংযোজনের ফলে কাহিনীর ঐক্য সংহতিহীন হয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলি সর্বদা সুস্পষ্ট ও বিকাশিত নয়। প্রধান চরিত্র পুষ্পমালা, রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতে বলেছেন "এই প্রহসনের বাইরে পুষ্পমালার জীবনের একটি প্রহসন আছে।" সেই প্রহসনের স্বরূপ নাটকে উদ্ঘাটিত না হওয়ায় চরিত্রটিতে অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। নাটকে স্বাভাবিকতা আনার জন্যে মাখনের দুই স্ত্রীর কলহের দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে—অথচ তাদের কলহের ভাষা কৃত্রিম ও প্রাণহীন। এধরণের ভাষা প্রয়োগের জন্য যে দক্ষতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথে তা অভাবনীয়। নাটকের সংলাপ সর্বত্র চরিত্রের উপযোগী হয়নি। সাধারণ চরিত্রসমূহ যে বুদ্ধিদীপ্ত চতুর ভাষা ব্যবহার করেছে, তা নিতান্তই কৃত্রিম মনে হয়। 'শেষের কবিতা' অথচ 'বাঁশরী'র মত তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'মুক্তির উপায়' প্রহসন নয়। ঘটনা সংস্থানে স্বাভাবিকতা নেই, সেজন্য কাহিনী নাটকে সরলভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। প্রহসন হিসাবে এটিকে ঠিক সার্থক বলা চলে না বরং ছোটগল্প হিসাবেই এর শিল্পমূল্য অধিক।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলিই বোধকরি দুর্বলতম রচনা। এর কারণ ঠিক ক্ষমতার অভাব নয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তার প্রাধান্যই বাস্তব জীবন-নির্ভর সার্থক প্রহসন রচনার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। কবির ধর্ম ও হাস্যরসিকের ধর্ম পরস্পরবিরোধী নয় কি? কবি অনুভূতিপ্রবণ, হাস্যরসিক প্রখর বাস্তববাদী। কবি আদর্শ সৌন্দর্যলোকের সন্ধান চান, হাস্যরসিক

বাস্তব সংসারের সঠিক গদ্যরূপটিকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যগ্র। প্রহসনের মধ্যে আবেগ-শূন্য স্থির বিচার বুদ্ধি নিয়ে মানবজীবনের মূল্যায়ন করা কবির পক্ষে কঠিন কম। রবীন্দ্রনাথ সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অবশ্য তাঁর প্রহসনে বিচ্ছিন্নভাবে এমন কতগুলি শিল্পগত সুষমার পরিচয় পাই—যা প্রহসনের ইতিহাসে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ কবি বলেই তা সম্ভব হয়েছে। 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভা'তে তিনি এক অপরূপ কাব্য-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কবিতাতে যে আবহ সৃষ্টি হতে পারত অনায়াসে নৈপুণ্য নিয়ে তা সৃষ্টি করেছেন প্রহসনে। বিশেষ করে 'চিরকুমার সভা'য় বিভিন্ন সংস্কৃত কবিতার অংশবিশেষ অনুবাদ করে সমগ্র প্রহসনটিতে অপূর্ব সৌগন্ধ সঞ্চার করেছেন। বৈকুণ্ঠ চরিত্র সমগ্র নাটকে একটি সকরুণ বেদনার অনুভব সৃষ্টি করেছে। এ সবই চিরন্তন সাহিত্য সম্পদ। তা'ছাড়া কথার খেলা—অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্য তাঁর প্রহসনগুলির অন্যতম আকর্ষণ। নির্মল কৌতুক হাস্য রবীন্দ্রনাথের প্রহসনেই প্রথম পাওয়া গেল। ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়াও যে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় একথাও রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রমাণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গীতি কবি হয়েও প্রহসন রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পেও হাস্যরসের অবতারণা আছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের হাস্যরসের সাথে প্রহসনের হাস্যরসের সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্ররচিত প্রহসনে হাস্যরস প্রহসনের শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে প্রায়শঃই উচ্চাঙ্গের হয়নি। প্রহসন বা কমেডি জাতীয় রচনায় প্রখর সমাজ-সচেতনতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং বাস্তববোধ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথে বিচ্ছিন্নভাবে এসব শিল্প-বৈশিষ্ট্য নেই এমন নয়, কিন্তু প্রহসনে এগুলির পূর্ণায়ত শিল্প প্রকাশ ঘটেনি। তাঁর প্রধান দুটি প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভা'য় বাস্তব পরিবেশ কোথায়? দুইটি প্রহসনেরই প্রণয়-স্বপ্নমুগ্ধ তরুণ-তরুণীরা কল্পজগতে বিচরণকারী, বাস্তবভূমিতে একবারও তাদের অবতরণ করতে দেখি না। মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীর দারিদ্র্য ও অন্যান্য সাংসারিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিক ভাব-কল্পনায় তা নিতান্তই অবান্তর। জীবন সম্পর্কে এই বিশেষ ভাবদৃষ্টি গীতিকবিতা অথবা কাব্যধর্মী ছোট গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে—কিন্তু প্রহসনে তা নিতান্তই বেমানান। প্রহসন বা কমেডি জাতীয় নাটকে ঘটনার দ্রুতগতি প্রধান সম্পদ। গতিকে ভারমুক্ত রাখার জন্য অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র ফেলে দিতে হয়—তবেই লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত প্রহসনের বক্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রহসন প্রায়ই অনাবশ্যকের ভারে মন্থরগতি। এক আসনে বসে দর্শক নাটক উপভোগ করেন—অনাবশ্যক ঘটনা ও বর্ণনা তাঁর আগ্রহকে স্তিমিত করে, কৌতূহলকে ক্লান্ত করে। নাটকের সংলাপ ও

চতুর সংলাপে পার্থক্য আছে। পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও বাগবৈদগ্ধ্য প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু নাটকীয় সংলাপের চরিত্র ও ঘটনানির্ভরতা তাতে মেলে না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন ব্যাপক চরিত্র সৃষ্টি দেখা যায় না—প্রহসনগুলিতেও চরিত্রবৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। জোড় বাঁধা চরিত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য, প্রহসনেও এই সীমাবদ্ধ রীতিতে চরিত্রসৃষ্টির প্রবণতা আছে। তাঁর প্রহসনের আঙ্গিনায় মোটামুটিভাবে একই ধরণের চরিত্র আনাগোনা করেছে। কিন্তু এতসব ত্রুটির পরেও বলতে হয় রবীন্দ্ররচিত প্রহসনে একটি ভিন্ন অভিনব স্বাদ ও সৌন্দর্যই প্রহসনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নামকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।